যেমন আছে রাজশাহী

বিএনপি-আওয়ামী লীগ ব্যস্ত দলীয় কোন্দলে... ক্যাম্পাসে চলছে

শিবির সন্ত্রাস...

অনুসন্ধান করেছেন **সাইফুল হাসান** ও **রিপন হায়দার,** ছবি **জাভিদ অপু**

৩১ মে '৮৮। কী একটা কাজে যেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজে গিয়েছিলাম। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম একদল সন্ত্রাসী বাঁশি বাজিয়ে, নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর বলে একজন ছাত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চায়নিজ কুড়াল, কিরিচ ও অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে একের পর এক আঘাত করতে থাকল তারা। মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করছিল। এই সন্ত্রাসী দলের মাঝে দেখলাম অনেকেই ইসলামী ছাত্র শিবিরের পরিচিত ক্যাডার। পরে জানলাম যাকে খুন করা হলো তার নাম জামিল আক্তার রতন। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বর্ষের ছাত্র। বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর মেডিকেল কলেজ শাখার সভাপতি। এখন নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। কারণ স্বচক্ষে দেখার পরও এই ঘটনা আমি কাউকে বলতে পারিনি.... ভয়ে। জীবনে এই প্রথমবার মুখ খুললাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে শিবির ক্যাডার এনামুল জহিরের চেহারা। সেদিন চায়নিজ কুড়াল হাতে রতনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছিলাম এনামুলকে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি এটাই যে, সেই এনামুল জহির এখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে জামিল আখতার রতন হত্যাকান্ডের বিবরণ

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৯ মে ১৯৯৭

জামিল আক্তার রতন ছিল ছাত্রমৈত্রী নেতা। রাজশাহীর রাজনৈতিক মহলের পরিচিত মুখ। রতনকে যারা হত্যা করেছিল তারাও দেখতে মানুষের মতো। হাত-পা-চোখ-কান-নাক সবই আছে। তাদের নাম শিবির। মানুষরূপী শিবির সন্ত্রাসীরা যে কতোটা ভয়ঙ্কর, বর্বর, নৃশংস হতে পারে তার প্রমাণ সেদিন দেখেছিল রাজশাহীবাসী, জেনেছিল দেশবাসী। রতন হত্যাকারীদের একজন এনামুল জহির। তিনি এখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক।

বিভাগীয় শহর রাজশাহীর প্রধান গর্ব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে

কেন্দ্র করেই নিয়ন্ত্রিত হয় রাজশাহীর রাজনীতি। দীর্ঘদিন বাম সংগঠনগুলো একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু বাম সংগঠনগুলোর এখন আর কোনো অস্তিত্ব নেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাম সংগঠনের ব্যর্থতা, প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা এবং নিজেদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যদিয়ে শিবির দখল করে নিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ আশপাশের পুরো এলাকা। ফলে রাজশাহীর রাজনীতিতে জামায়াত-শিবির এখন বড় ফ্যাক্টর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এখন শিবির ছাড়া অন্য কোনো সংগঠনের বোঝা কষ্টকর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যে এক সময় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে মুখরিত থাকতো- এটা এখন রূপকথা। ক্যাম্পাসের মতো পুরো রাজশাহীতেও বিএনপি আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোনো কর্মকাণ্ড চোখে পড়ে না। এই দলগুলো বিশেষ করে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ব্যস্ত দলীয় কোন্দলে। আর এর পুরো সুযোগ নিয়ে ক্রমেই শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে জামায়াত-শিবির। আর ভয়াবহ পরিণতি বরণ করতে হচ্ছে এবং হবে রাজশাহীবাসীর। শুধু আওয়ামী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নয়, বিএনপি ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলও শিবির আতঙ্কে আতঙ্কিত। ক্ষমতায় বিএনপি থাকলেও পূর্বের মতো প্রশাসন এখনও শিবিরের পক্ষে।

যেমন আছে রাজশাহী : জাতীয় রাজনীতি ও জামায়াত

বরেন্দ্র সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র রাজশাহী। প্রাচীন ঐতিহ্যে ভরপুর এই শহরের মানুষ কেমন আছেন? কেমন চলছে এখানকার রাজনীতি?

রাজশাহী শহর ও বিভাগ বিএনপি'র একক অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। বিগত ৩টি সংসদ নির্বাচনে পুরো রাজশাহী বিভাগে বিএনপি'র প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে। বিগত সংসদ নির্বাচনগুলোতে রাজশাহী অঞ্চলের ১৮ আসনের মধ্যে ১৭টি আসনই পায় বিএনপি। পুরো বিভাগে যেমন বিএনপি একক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, রাজশাহী শহরের অবস্থাও ব্যতিক্রম নয়। প্রশাসনিকভাবে রাজশাহী নগরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ সিটি কর্পোরেশন মেয়র। শেষ দুটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী মিজানুর রহমান মিনু মেয়র হয়েছেন। যদিও সর্বশেষ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সাধারণ রিকশাওয়ালা থেকে ছাত্রদলের কর্মী পর্যন্ত সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে বিগত নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। স্থানীয় অনেক রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষের ধারণা, ফজলে হোসেন বাদশাকে নির্বাচনে

গত ২৮ আগস্ট সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মিছিল ও সাংবাদিকদের হামলা করতে যাচ্ছে শিবির ক্যাডাররা। অভিযোগ আছে, প্রক্টর উপস্থিত থেকে শিবির ক্যাডারদের লেলিয়ে দেন

শিবির ও জামায়াত এ কারণে আমার ওপর ভয়াবহ চটে যায়। আমার বাসায় আক্রমণ করে। যা হোক, আমি ওদের মেরুদন্ডটা ভেঙে দিয়েছিলাম, বিষদাঁত ভাঙতে পারিনি। তার আগেই আমাকে সরিয়ে দেয়া হয়। এই দুঃখটা আমার সারা জীবন থাকবে।'

ড. আব্দুল খালেক
সাবেক ভিসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জোর করে হারানো হয়েছে। ফজলে হোসেন বাদশা নির্বাচনের রায়ের ওপর কোর্টে মামলা করেছেন এবং বিষয়টি বিচারাধীন। ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, 'আমি প্রায় ১৬ হাজার ৫০০ ভোটে জিতেছি। কিন্তু প্রশাসনের সহযোগিতায় আমাকে জোর করে হারানো হয়েছে।' জানা যায়, গত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থী ফজলে হোসান বাদশাকে আওয়ামী লীগ পরোক্ষভাবে সমর্থন দেয়। বর্তমানে রাজশাহী শহরের সকল কর্তৃত্বের মালিক মেয়র মিজানুর রহমান মিনু। রাজশাহী শহরে বিএনপি বলতেই মানুষ মিজানুর রহমান মিনুকেই বোঝে। '৯৪-এর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মিনু সারা বাংলাদেশের সকল মেয়রের চেয়ে বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, রাজশাহী-২-এর সংসদ সদস্য ও মেয়র মিনুই এখন এই নগরের পিতা। নগরের সবকিছু তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এক সময় রাজশাহীতে মিনুর প্রচন্ড জনপ্রিয়তা থাকলেও সেটা এখন ভাটার দিকে। যে কারণে অনেকেই মনে করেন, মিনু গত কয়েক বছরে বিশেষ করে বিগত নির্বাচনে অনেক বেশি জামায়াতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। রাজশাহী বিএনপি এখন তিন গ্রুপে বিভক্ত। এক গ্রুপের নেতৃত্বে আছেন মেয়র মিজানুর রহমান মিনু, অপর গ্রুপের নেতৃত্বে সাবেক ভূমি প্রতিমন্ত্রী কবীর হোসন। তানোর এলাকাভিত্তিক ছোট একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক। রাজশাহী বিএনপি ৩ গ্রুপে বিভক্ত হলেও মূল গ্রুপিং মিনু ও কবীর হোসেনের মধ্যে। বিগত সংসদ নির্বাচনে এই দুই জনের গ্রুপিংয়ের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। বিগত নির্বাচনে কবীর হোসেন নমিনেশন চান রাজশাহী সদর থেকে। কেননা, আগেও এ আসন থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। একই আসনে নমিনেশন চান মেয়র মিজানুর রহমান মিনু। এই নিয়ে কবীর হোসেন ও মিনুর মধ্যে বিরোধ চরমে ওঠে। মিনুর এই সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি কবীর হোসেন। এক পর্যায়ে দু'জনের বিরোধিতা এমন পর্যায়ে

রাবি'তে সাংস্কৃতিক আন্দোলন নেই। আছে শিবিরের আস্ফালন। সকল সাংস্কৃতিক আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে শিবির বিশ্ববিদ্যালয়কে পশ্চাৎপদ ধর্মীয় গোড়ামীর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। 'তোরাবোরা' রাবি'র মতিহার হলের শিবিরের একটি কক্ষের নাম। তালেবানদের প্রতি শিবিরের ভালোবাসার নিদর্শন এই 'তোরাবোরা'।

পৌঁছায় যে কবীর হোসেন আওয়ামী লীগে যোগ দেয়ার চিন্তা-ভাবনাও করতে থাকে। অবশেষে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ শক্ত হাতে পরিস্থিতি সামাল দেন। বিএনপি'র স্ট্যান্ডিং কমিটি রাজশাহী সদর আসনে মনোনয়ন দেয় মিনুকে। কবীর হোসেন নির্বাচন করেন (চারঘাটা-বাঘা) রাজশাহী-৫ আসন থেকে। দু'জনই নির্বাচনে জয়ী হন। রাজশাহী বিএনপি জেলা কমিটির নেতৃত্বে রয়েছে কবীর হোসেন গ্রুপের লোক। গত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরান মনির স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মিনুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জানা যায়, অ্যাডভোকেট কামরান মনির কবীর হোসেনের লোক। কামরান মনির বর্তমানে দল থেকে বহিষ্কৃত।

অনুসন্ধানে জানা যায়, রাজশাহী নগর বিএনপি'র ঘাঁটি বলে পরিচিত হলেও সংগঠনে বর্তমানে স্থবিরতা বিরাজ করছে। শহরকেন্দ্রিক অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ নগর ভবন ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যালয়ের ঠিকাদারি আর তদ্বিরে ব্যস্ত। বিএনপি'র দলীয় কার্যক্রম আগের মতো নেই বললেই চলে। জেলা বিএনপি'র নেতৃবৃন্দও মোটামুটি চুপচাপ। এ বিষয়ে স্থানীয় একজন রাজনীতিক বলেন, 'সরকারে গেলেই সব দল সরকার হয়ে যায়। তাই তাদের কর্মসূচিও থাকে না। কর্মসূচি পালনেরও দায় থাকে না। বিএনপি এখন ক্ষমতায়, অতএব তাদের সব নেতাকর্মী এখন সরকার। সংগঠন গতিশীল করা না করা দিয়ে তাদের কিছু আসে যায় না।'

বিএনপি বা অন্য রাজনীতিক দল বিশেষ করে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রাজশাহীতে কবির হোসেনের গ্রুপ অবহেলিত। বিএনপি'র এই দুই নেতার দ্বন্দ্ব থাকলেও শহর থেকে কবির হোসেনের গ্রুপ মূল রাজনীতি থেকে আউট। স্থানীয় একজন বিএনপি নেতার মতে, 'অ্যাডভোকেট আব্দুল হাই, অ্যাডভোকেট এনামুল হক শহরে বিএনপি'র পরিশ্রমী ও ভালো সংগঠক হিসেবে পরিচিত। তারা এখন নিষ্ক্রিয়। কামরান মনির বহিষ্কৃত। এরাই সংগঠনের মূল স্রোত।' '৯১-'৯৫ সময়ে একক নেতা হিসেবে মিনু, কবীর হোসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়। সে সময় তার জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। ব্যক্তি বিশেষের সুবিধা দানের প্রবণতা, বিশেষ করে ধীরে ধীরে জামায়াতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যাওয়াকে বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা খুব ভালোভাবে দেখেনি। মিনুর সঙ্গে কবীর হোসেনের পার্থক্য হচ্ছে, তিনি সবসময় বিএনপির নিজস্ব শক্তির ওপর নির্ভরশীল। পাশাপাশি স্থানীয় ও পুরো জেলা বিএনপিতে কবীর হোসেনের সাংগঠনিক যোগাযোগ খুবই ভালো। যোগ্যতার বিচারে কবীর হোসনে ভালো নেতা। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামোয় মিনু আবার কবীর হোসেনের চেয়ে শক্তিশালী। জানা যায়, কবীর হোসেন প্রচন্ডভাবে জামায়াত বিরোধী। বিএনপি'র জোট নেতৃত্বের ফলে দলের মধ্যে জামায়াত বিরোধীদের অবস্থান বেশ দুর্বল। মিনুর ব্যক্তি জনপ্রিয়তা ও জামায়াত লবি এবং কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কবীর হোসেনের অবস্থান বেশ দুর্বলই বলা যায়। যদিও রাজশাহী বিএনপি'র মধ্যে কবীর হোসেনের অবস্থান মিনুর চেয়ে ভালো। জানা যায়, শহরের বড় একটা ব্যবসায়ী গ্রুপ ও শহর ছাত্রদলই মিনুর শক্তির উৎস। অন্যদিকে ব্যারিস্টার আমিনুল হক ছোট গ্রুপের নেতৃত্ব দিলেও মন্ত্রী হবার কারণে রাজশাহীর স্থানীয় রাজনীতিতে নিজেকে ঐভাবে জড়ান না। কবীর হোসেন প্রবীণ নেতা হিসেবে একটি মন্ত্রণালয় আশা করতেন। মন্ত্রিত্ব না পাওয়ায়ও তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর নাখোশ। বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ কোন্দল সম্পর্কে ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, 'কবীর হোসেন রাজনৈতিকভাবে আমার বিপরীত অবস্থানে থাকলেও সে ভালো নেতা। পুরো অঞ্চলে কবীর সাহেবের সাংগঠনিক যোগাযোগও ভালো। আর মিনুর সেই ক্রেজ আর নেই। সে এখন যথেষ্ট আনপপুলার। সে এখন পুরোপুরি জামায়াত আর প্রশাসন নির্ভর হয়ে পড়েছে।' অন্য একটি সূত্রে জানা যায়, মিনুর সঙ্গে রাজশাহীর মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হকের যোগাযোগ ভালো। অন্যদিকে সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও তিনি ভালো সম্পর্ক রেখে চলেন। দলীয় কোন্দল ও বিএনপি'র সাংগঠনিক অবস্থা সম্পর্কে মেয়র মিজানুর রহমান মিনু সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোনো কোন্দল নেই। যেটা আছে সেটা হলো নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা সব দলেই আছে। আমাদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগতা আছে বলেই রাজশাহীর পুরো অঞ্চলে বিএনপি একক দল। গত নির্বাচনে কবীর ভাই আমার আসন থেকে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। আগে কবীর ভাই এখান থেকে নির্বাচন করতেন। এখন স্ট্যান্ডিং কমিটির সিদ্ধান্ত হলো, আমাকে শহর থেকে নির্বাচন করতে হবে। আমার কিছু করার নেই। আর সংগঠন স্থবির কথাটা ঠিক নয়। রাজশাহীর সকল শ্রেণীর মানুষের, রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক। কোনো ঝামেলা হলে এক টেবিলে বসে মীমাংসা করতে পারি। অন্যদিকে দলীয় কোন্দল থাকলে মারামারি, কাটাকাটি হতো। তাকি হয়েছে? হয়নি। এখানকার মানুষ সহনশীল। আমরা প্রত্যেকেই একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।' জামায়াত নির্ভরশীলতার কথা অস্বীকার করে তিনি বলেন, জোট রাজনীতির ফলে গত নির্বাচনে আমরা দু'জনই জামায়াতের ভোট পেয়েছি। আর একটি ব্যাপার হলো, ঐতিহাসিকভাবে এ এলাকার লোক ভারত বিরোধী। অতএব যারা ভারত বিরোধী রাজনীতি করতে চান, তাদের জন্য এ এলাকা খুব অনুকূল। যে কারণে জামায়াত সাংগঠনিকভাবে এগিয়েছে। তাদের সংগঠন ভালো। সততা, নিষ্ঠা দিয়ে কাজ করেছে বলেই তাদের সংগঠন ভালো।'

রাজশাহী বিএনপি এখন একজন নেতার ওপর নির্ভরশীল। রাজশাহী বিএনপিতে তেমন কোনো নেতা গড়ে ওঠেনি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিএনপি নেতৃত্ব শূন্যতায়

ভুগবে। কবীর হোসেন রাজনীতিতে কোণঠাসা। বয়স হয়ে যাবার কারণে তিনিও আর আগের মতো পরিশ্রম করতে পারেন না। মিনু মেয়র ও এমপি হওয়ার ফলে তিনি দলকে ঠিকমতো সময় দিতে পারেন না বলে অনেকেই অভিযোগ করেন।

রাজশাহীর মানুষকে আওয়ামী লীগ বিরোধী বললে ভুল বলা হয় না। আওয়ামী লীগ এ এলাকায় স্বাধীনতার পর থেকেই দুর্বল। আওয়ামী লীগের সংগঠন ভালো না হওয়ার আরও একটি কারণ হলো যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। বঙ্গবন্ধুর সময় মোঃ কামরুজ্জামান ছাড়া আর কোনো বড় নেতা এ এলাকার আওয়ামী লীগে আসেনি। '৭৫ পরবর্তী প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ সময় আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বাইরে থাকার কারণে দুর্বল সংগঠন আরও দুর্বল হয়েছে। মাহামুদুল হক টুলু নামের একজন প্রবীণ নেতা আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করার চেষ্টা করলেও এক সময় তিনি থেমে যান। অবশ্য আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীদের অভিযোগ, নেতৃবৃন্দ সঠিকভাবে দলকে এগিয়ে নেয়ার উদ্যোগ নেয়নি। নেতৃবৃন্দের কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ করার মানসিকতার অভাব আওয়ামী লীগ দুর্বল হওয়ার অন্যতম কারণ। এ অঞ্চলে ভোটের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ দুর্বল হলেও ভোট কিন্তু তারা কম পায় না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কি কেন্দ্রীয়, কি স্থানীয় কোনোভাবেই আওয়ামী লীগ মানুষকে বোঝাতে পারেনি যে তারা এ এলাকার জন্য কাজ করতে চায়। কিংবা এই এলাকাকে প্রাধান্য দিয়েও আওয়ামী লীগের তেমন কোনো কর্মসূচি ছিল না।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, আওয়ামী লীগের সংগঠন না থাকলেও দলীয় কোন্দলে পিছিয়ে নেই। জানা গেছে, নগর ও জেলার রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের ৪টি গ্রুপ রয়েছে। জেলা আওয়ামী লীগের নেতা ও রাজশাহী চেম্বারের প্রেসিডেন্ট ওমর ফারুক চৌধুরী একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন। শহর বা জেলা আওয়ামী লীগে তার অবস্থান ভীষণ দুর্বল। অপর গ্রুপের নেতৃত্ব দেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম মোঃ ফারুক। জেলা সংগঠনে তার প্রভাব মোটামুটি ভালো। কিন্তু সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সমন্বয়ের অভাব আওয়ামী লীগকে গণমুখী দল হিসেবে গড়ার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। অন্যদিকে নগর আওয়ামী লীগের দ্বন্দ্ব মূলত মাহাবুবুজ্জামান ভুলু ও খায়রুজ্জামান লিটনের মধ্যে। গ্রুপগত অবস্থানে লিটনের অবস্থাই সবচেয়ে ভালো। জানা গেছে, পুরো রাজশাহীর আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ এখন আবর্তিত হয় খায়রুজ্জামান লিটনকে ঘিরে। মোঃ কামরুজ্জামানের ছেলে লিটন বিদেশে পড়ালেখা শেষ করে রাজশাহীতে এসে দলের হাল ধরেন। কিন্তু রাজনীতিতে অনভিজ্ঞতা, দলীয় নেতাকর্মীদের মাঝে সমন্বয়হীনতার অভাব তিনি দূর করতে পারছেন না। যুবলীগের একজন কর্মী সাপ্তাহিক ২০০০কে

'আমরা ছাত্রদলকে যতটুকু সহযোগিতা করছি তার এক শতাংশও শিবিরকে করিনি। সবাই আমার কাছে সমান। আমরা নিরপেক্ষভাবে চলার চেষ্টা করছি'

ড. নূরুল আবসার
প্রক্টর, রাবি

এক নজরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ বছর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার উপায় হিসেবে 'রগকাটা' পদ্ধতির প্রচলন হয়। আর এই লোমহর্ষক পদ্ধতিটি উদ্ভাবনের অন্যতম দাবিদার ইসলামী ছাত্রশিবির। আর তারাই হলো এই পদ্ধতির 'ওয়ান অ্যান্ড অনলি' প্রয়োগকারী। শিবিরের এই 'রগকাটা' পদ্ধতির প্রথম বলি হয় ছাত্রমৈত্রী নেতা জামিল আখতার রতন।

অস্ত্র হিসেবে প্রথম চাইনিজ কুড়ালের ব্যবহার শুরু হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়েই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন নেতা হেলাল উদ্দিন প্রতিপক্ষের চাইনিজ কুড়ালের আঘাতে প্রথম আহত হন।

১৯৭৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত নিহত ২৫ জনের মধ্যে ৯ জন শিবির কর্মী, ৩ জন ছাত্রদল কর্মী, ২ জন ছাত্রলীগ কর্মী, ২ জন জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মী, ২ জন ছাত্রমৈত্রীর নেতা-কর্মী, ১ জন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী ও ৯ জন বহিরাগত।

১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথমে সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের সামনে বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত হয় যুবলীগ কর্মী মজনু।

একই বছর বিপক্ষ গ্রুপের হাতে নিহত হয় ছাত্রলীগ নেতা তানভীর।

১৯৮০ সালের ৩ নবেম্বর ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে একটি ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মী মীর মোস্তাক এলাহীকে প্রকাশ্য দিবালোকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

১৯৮২ সালের ১১ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও শিবির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে শিবির ক্যাডার জব্বার, হামিদ, আইয়ুব ও সাব্বির নিহত হয়।

জাসদ ছাত্রলীগের নেতা শাজাহান সিরাজ ও সংবাদপত্র হকার আজিজ ১৯৮৪ সালের ২২ ডিসেম্বর পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ আহূত ৪৮ ঘণ্টা হরতাল চলাকালে এ হত্যাকান্ড দু'টি সংঘটিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গ বহিরাগত গ্রামবাসীর সংঘর্ষে হেদায়েত নামে একজন বহিরাগত নিহত হয় ১৯৮৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর।

১৯৮৮ সালের ১৭ নবেম্বর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে সংঘর্ষে আসলাম ও আসগর নামে দুই শিবিরকর্মী নিহত।

এই দুই পক্ষের সংঘর্ষে ১৯৮৯ সালের ১৮ এপ্রিল শিবিরকর্মী শফিকুর রহমান নিহত।

১৯৮৯ সালের ২২ জুন আবারও এই দুই পক্ষের সংঘর্ষে শিবিরকর্মী খলিলুর রহমান নিহত।

১৯৯২ সালের ১৭ মার্চ গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, শিবির ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে জাসদ ছাত্রলীগের নেতা ইয়াসির আরাফাত পিটু নিহত। বিশ্ববিদ্যালয়ের লতিফ হল ঐদিন রাতে শিবির কর্মীদের হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ যাবৎকাল সবচেয়ে ভয়াবহতম সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ১৯৯৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। এদিন শিবিরের সাথে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, ছাত্রদল ও মুজিববাদী ছাত্রলীগের সংঘর্ষে ছাত্রদলের বিশ্বজিৎ ও নতুন, ছাত্র ইউনিয়নের তপন এবং শিবিরের রবিউল ও মোস্তাফিজ মোট ৫ জন ছাত্র নিহত।

১৯৯৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ছাত্রমৈত্রীর জুবায়ের চৌধুরী রিমু শিবির কর্মীদের হাতে নিহত।

১৯৯৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে শিবিরকর্মী মোস্তাফিজ ও ইসমাইল নিহত।

প্রতিরোধপরায়ণ শিবিরকর্মীরা ১৯৯৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্রমৈত্রীর দেবাশীষ ভট্টাচার্য রূপমকে একটি ঢাকাগামী নৈশকোচ থেকে নামিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।

বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হয়েছে ৫৩ বার। বিভিন্নমেয়াদী এসব অনির্ধারিত বন্ধের জন্য ছাত্রছাত্রীরা হারিয়েছে অনেকগুলো অমূল্য শিক্ষা বছর।

বলেন, 'মূল গ্রুপিং এখন ওমর ফারুক চৌধুরী ও লিটনের মধ্যে। অপর দু'জন অর্থবিত্তে এদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে।' অনুসন্ধানে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে, রাজশাহী থেকে এমন কোনো নেতা তৈরি হয়নি যারা জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। যেটা বিএনপি, জামায়াত বা বাম দলগুলোর ক্ষেত্রে ঘটেছে। বিগত সরকারের সময়ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ দল গড়ার চেয়ে নিজেদের ভাগ-বাটোয়ারা আর কোন্দলেই বেশি ব্যস্ত ছিলো। নাম প্রাকশে অনিচ্ছুক একজন রাজনৈতিক নেতা বলেন, 'আওয়ামী লীগের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও সেটা ততটা প্রকট নয়। কারণ দলই নেই, দ্বন্দ্ব করবে কি নিয়ে। বাস্তবতা হলো, আওয়ামী লীগ স্থানীয় রাজনীতিতে চতুর্থ শক্তি। তাদের চেয়ে বাদশার ওয়ার্কার্স পার্টির অবস্থাও অনেক ভালো। দলগতভাবে না হলেও বাদশার কারণে তো বটেই।' একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ চাচ্ছে বাদশাকে দলে নিতে। এবং ফজলে হোসেন বাদশা আওয়ামী লীগে যোগ দিলে দলের চেহারা যে বদলে যাবে এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। দলীয় কর্মীরা এমন আশাও করেন বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, 'আওয়ামী লীগে যাওয়ার তো কোনো কারণ দেখি না। এটা হয়তো তাদের প্রত্যাশা।'

উত্তরবঙ্গে জাতীয় পার্টির অবস্থা ভালো হলেও রাজশাহীতে জাতীয় পার্টির কোনো অবস্থান নেই। জাতীয় রাজনীতির ভিত্তিতে বিচার করলে জামায়াত রাজশাহীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সংগঠন। এছাড়া সংগঠনগতভাবে রাজশাহীতে তারা সবচেয়ে বড় শক্তি। রাজশাহীতে কেন্দ্রীয়ভাবে জামায়াতের কোনো নেতা নেই। কিন্তু বিশাল সংগঠন আছে। আছে অর্থ-অস্ত্র এবং ক্যাডার। আর আছে প্রশাসনের সহযোগিতা। অন্যদিকে স্থানীয় জনগণের ভারত বিরোধী বা আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব জামায়াতকে সংগঠিত করতে সাহায্য করেছে। রাজশাহী জেলা জামায়াতের আমির আতাউর রহমানের মিনু কিংবা বাদশার মতো নাম-ডাক না থাকলেও এই মুহূর্তে তিনি হলেন রাজশাহীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ। '৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এলে তারা রাষ্ট্রীয় শক্তি সংগঠন বিকাশের কাজে লাগায়। এবার নির্বাচনের পর জামায়াত তো সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের অংশ। রাজশাহীর রাজনীতির ইতিহাসে জামায়াত যেভাবে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা পেয়েছে তা অন্য কেউই পায়নি বলে জানালেন বিএনপি'র একজন সিনিয়র নেতা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই নেতা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'বিএনপি'র দ্বন্দ্বের মূল কারণ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিতর্ক। একটি অংশ জামায়াতের সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করেছে। আর কেন্দ্রীয় নির্দেশও মোটামুটি গত ১০ বছর এমনই ছিল। ফলে যারা সংগঠনের মধ্যে জামায়াত বিরোধী তারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। সারা দেশেই এটা ঘটেছে। জামায়াত যেহেতু ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন, সেহেতু তাদের কোনো নেতার ক্যারিশমা দেখানোর সুযোগ কম। ফলে তারা যখন যতটুকু সুযোগ পেয়েছে, সেটাকেই কাজে লাগিয়েছে। আর এখন তো তাদের ওপর কথা বলারই কোনো সুযোগ নেই।'

এই নেতার কথার প্রমাণ মেলে এ বছরের ৮-৯ এপ্রিলের ঘটনায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির ছাত্রদলের ওপর আক্রমণ করে। বেশ কয়েকজন ছাত্রদল নেতা-কর্মী শিবির ক্যাডারদের হাতে নির্যাতিত হয়। এই ঘটনায় রাজশাহী বিএনপি থেকে প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত দেয়া হয়নি বলে জানা গেছে। মিনু এবং জামায়াত আমিরের মধ্যস্থতায় মিনু ছাত্রদলের ছেলেদেরই তিরস্কার করেন বলে একজন ছাত্রদল নেতা জানান। কারণ সামনে ছিল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। জামায়াতের ভোট ছাড়া তার পক্ষে জেতা প্রায় অসম্ভব। এ বিষয়ে মিনুর উত্তর, 'জোটবদ্ধ রাজনীতিতে আছি আমরা। মীমাংসা করে দেবো না তো মারামারি করতে বলবো?' রাজশাহীর রাজনীতির আরও একটি বড় লক্ষ্য হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাব বিস্তার করা। সে কাজে অন্যরা ব্যর্থ হলেও জামায়াত পুরোপুরি সফল। এ জামায়াত রাজশাহীতে মিনুকেন্দ্রিক হওয়ায় তারা প্রশাসন ও সংগঠনে, জনগণ ও ক্ষমতায়নে সবাইকে পিছে ফেলে দিয়েছে। অন্যদিকে রাজশাহীতে প্রগতিশীল ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন না থাকায় জামায়াত ধর্মীয় রাজনীতির সুবিধা পেয়েছে। বিএনপি ছাড়া যেহেতু অন্য সংগঠনের তেমন কোনো প্রভাব রাজশাহীতে নেই, সে কারণে আপাতত জামায়াতের সামনে কোনো বাধাও নেই। বিএনপি জামায়াতের, জামায়াত বিএনপি'র- এই নীতিতে জামায়াতই এখন রাজশাহীরে সবচেয়ে বড় সংগঠন।

'বিশ্বায়নের নামে সারা বিশ্বে যা হচ্ছে তাতে বাম, সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন মার খেয়েছে।... শিবিরের উত্থান, এর পেছনে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনেক উপাদান কাজ করেছে। তাদের অস্ত্র, অর্থ, প্রশাসন আছে। সুতরাং এই জায়গায়ই আমাদের লড়াই। আমরা একটা খারাপ সময়ের মধ্যে আছি'

হাসান আজিজুল হক
বিশিষ্ট গল্পকার, শিক্ষক রাবি, দর্শন বিভাগ

রাবি ক্যাম্পাস : শিবির ছাড়া কেউ নেই

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এখন পুরোপুরি শিবিরের দখলে। ছাত্রদল বাদে অন্য সকল সংগঠনকে ক্যাম্পাস থেকে শিবির তাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু ক্যাম্পাস নয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের দখলে। ভিসি, প্রক্টর, ছাত্র উপদেষ্টা বিএনপিপন্থী শিক্ষক হলেও তারাই শিবিরের প্রধান সেল্টারদাতা। গত এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রশাসনের একচোখ নীতির অনেকগুলো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। ছাত্রদল ক্যাম্পাসে থাকলেও তাদের অবস্থা বেশ নাজুক। গত এক বছরের শিবিরের হাতে মার খেয়েছে ছাত্রদলসহ সকল সংগঠন। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ধর্মঘটে শিবির প্রক্টরের সহযোগিতায় আক্রমণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। যদিও প্রক্টর ড. নুরুল আবসার এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল স্তর যে শিবির ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা দখল করে নিয়েছে একথা সকলেই স্বীকার করেন।

এই অভিযোগ অবশ্য ছাত্রদলের ভেতর থেকেই আসছে। এই অভিযোগের জবাবে বর্তমান প্রক্টর ড. নুরুল আবছার বলেন, 'আমরা ছাত্রদলকে যতটুকু সহযোগিতা করছি তার এক শতাংশও শিবিরকে করিনি। সবাই আমার কাছে সমান। আমরা নিরপেক্ষভাবে চলার চেষ্টা করছি।' বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত শিক্ষক ও ছাত্র উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম বলেন, ' বিগত কিছু দিনের ঘটনায় সত্য যে একদম নেই তা নয়। তবে আমরা সকলকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে চাচ্ছি।

এখানে পক্ষপাতিত্বের কোনো সুযোগ নেই।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্রদল নেতা বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে রফিকুল ইসলাম নিরপেক্ষ মানতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু প্রক্টর ও ভিসি কার্যান্তরে শিবিরকেই সাহায্য করছে। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্দোলন ভাঙতে ছাত্রদল যায়নি। প্রক্টর শিবিরকে সঙ্গে করে গেছে। শিবির সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পিটিয়েছে। পত্রিকায় ছবি এসেছে। সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এতে শিবিরের কোনো ক্ষতি হয়নি। এটাই আমাদের ভিসি ও প্রক্টর বুঝছেন না।' বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন প্রাণের স্পন্দন নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির ঘোষিত কিছু সেন্সরশিপও চলছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা শিবির কর্মীদের চোখ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। হলগুলোতে সাধারণ ছাত্রদের শিবিরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর চলতে হয়। শিবিরের যে কোনো অনুষ্ঠানে, হলগুলোতে শুরু হয় চাঁদাবাজি। ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্য প্রাণ বাঁচিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির সভাপতির সঙ্গে কথা বলে এমন ধারণাই পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এক ছাত্র ব্যাখ্যা করলেন এভাবে, 'আমরা এরকমভাবে বেঁচে আছি। যেভাবে রেখেছে শিবির । এখানে আমাদের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই। তারা যদি বলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, আমরাও বলি বন্ধ। তারা যদি বলে সূর্য পশ্চিমে উঠবে, আমরাও তাই। কারণ প্রাণটা আমার কাছে খুব মূল্যবান। মৃত্যুকে ভয় পাই। যত দ্রুত সম্ভব পড়াশোনা শেষ করে ঘরে ফিরতে চাই।' বোঝা যায়, ছাত্রশিবিরের কাছে পুরো ক্যাম্পাস কতোটা অসহায়।

১৯৭৩ থেকে '৮০ : যেভাবে শুরু

১৯৭৩ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ভালোই চলছিল। '৭৫ সালে ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়। ১৯৭৯ সালে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন। তিনি রাবি'র ভিসি বানান মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ড. এমএ বারীকে। যিনি '৭১-এ টিক্কা খানের নিয়োগপ্রাপ্ত রাবি'র ভিসি ছিলেন। সেই থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটের শুরু। এই সময়ের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশিষ্ট গল্পকার ও দর্শন বিভাগের শিক্ষক হাসান আজিজুল হক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ শেষ। সবার চোখে তখন প্রবল উন্মাদনা সমাজ গড়ার। এর পাশাপাশি প্রগতিশীল মুক্তিযোদ্ধাপন্থী শিক্ষকদের ভেতরে ভেতরে একটা ভাগও চলছিল। '৭১-এর ভিসি এমএ বারীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল, সে পরে পালিয়ে যায়। ট্রাইব্যুনালে বারী বেঁচে যায়। আমার জানা মতে, তার বিরুদ্ধে অনেকে সাক্ষীও দিয়েছিল। শুনেছি বিপক্ষে যারা সাক্ষী দিয়েছিল তাদের ভয় দেখানো হয়। যা হোক, এখনও আমার কাছে রহস্যই থেকে গেলো সে কিভাবে বেঁচে গেলো? এমএ বারী '৭৯ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হয়ে এলেন। সেই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াতিকরণের শুরু।'

শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম বলেন, 'যুদ্ধ শেষে

'আমি চেষ্টা করি নিষ্ঠা ও শ্রম দিয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণের'

মিজানুর রহমান মিনু, মেয়র
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

সাপ্তাহিক ২০০০ : গত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে-

মিজানুর রহমান মিনু : নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে। রাজশাহীর জনগণ এটা জানে। সবাই জানে। বিএনপি রাজশাহী অঞ্চলের একক দল। আগের নির্বাচনেও আমি সব মেয়রের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলাম। তারপরও বিষয়টা নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছে। তাই কোনো মন্তব্য করবো না। বাদশা ভাই বড় ভাই। জাতীয় নেতা। আগের নির্বাচনগুলো পর্যালোচনা করলেই তার অবস্থান বুঝতে পারবেন।

২০০০ : আপনি অনেক বেশি জামায়াতের ওপর নির্ভরশীল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল শিবিরের হাতে মার খাচ্ছে। আপনি যাচ্ছেন শিবিরের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে। কর্মীদের অনেকের আপনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছে।

মিনু : দেখেন, আমরা জোটবদ্ধভাবে আছি। জোটের রাজনীতির ফলে বিএনপি এবং জামায়াত দেশ গঠনে একসঙ্গে কাজ করছে। আমি আমার দল ও কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল। আমি চেষ্টা করি নিষ্ঠা, শ্রম দিয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণের। আর মারামারি হলে নেতা হিসেবে আমার কাজ হলো মীমাংসা করে দেয়া। ছাত্রদলকে কি মারামারি করতে বলবো? জামায়াতও রাজশাহীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। ঐতিহাসিকভাবে এ এলাকার মানুষ ভারত বিরোধী ও অতিথিপরায়ণ। জামায়াতও শ্রম, পরিশ্রম দিয়ে সংগঠনকে ভালো অবস্থায় নিয়ে গেছে। নির্ভরশীলতার কিছু নেই।

২০০০ : কবির হোসেনের সঙ্গে দলীয় কোন্দলও জামায়াতকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। বিএনপি'র প্রশ্রয় তো ছিলোই।

মিনু : কবির ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের কোন্দল নেই। সে অত্যন্ত যোগ্য ও প্রবীণ নেতা। আমাদের মধ্যে যেটা আছে, সেটা হলা নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা। এই সুস্থ প্রতিযোগিতার কারণেই রাজশাহী এলাকায় বিএনপি এতো ভালো অবস্থানে। যেহেতু আমাদের মধ্যে জোট আছে, সেহেতু প্রশ্রয় কথাটা সম্ভবত ঠিক নয়। প্রত্যেকেই তো তার সংগঠনকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। জামায়াতও করেছে। আমাদের সঙ্গে সবার সম্পর্ক ভালো। আমরা যারা রাজনীতি করি সবার লক্ষ্যই কিন্তু দেশের ভালো করা। তাই নয় কি? জামায়াতও তো একই লক্ষ্যে এগোচ্ছে। না ভাই, আমাদের কোনো দলীয় কোন্দল নেই।

২০০০ : আপনি স্বীকার না করলেও গত সংসদ নির্বাচনে কবির হোসেনের সঙ্গে আপনার দ্বন্দ্বের কথা পত্রিকায় এসেছে-

মিনু : দ্বন্দ্ব নয়, কবির ভাই এ আসন থেকে নির্বাচন করতো। দল আমাকে এ আসন থেকে নির্বাচন করতে বললো। নমিনেশন দেয়ার মালিক স্ট্যান্ডিং কমিটি। পরে কবির ভাই চারঘাট-বাঘা থেকে নির্বাচন করেন। আমি তো জিতেছি। ফেল তো করিনি। আমি আবারও বলবো, দলে কোন্দল নেই। নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা আছে। দ্বন্দ্ব থাকলে মারামারি, খুনাখুনি থাকতো। সেটা তো নেই। বরং এখানকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবস্থা বাংলাদেশের যেকোনো এলাকার চেয়ে ভালো। এলাকার উন্নয়নে আমরা সবাই কাজ করেছি, করছি।

২০০০ : অভিযোগ আছে, আপনি রাজশাহীতে নেতা তৈরি হতে দিচ্ছেন না। নতুন নেতৃত্বের অভাবে বিএনপি আপনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।...

মিনু : কথাটা, অভিযোগটা ঠিক নয়। আমাদের দলে অনেক তরুণ নেতৃত্ব আছে। তাদের কপাল খারাপ, তারা ফোকাস্ড হয় নাই। আরো একটা ব্যাপার হলো, এজন্য সম্ভবত কপাল লাগে। আমি অসম্ভব সৌভাগ্যবান যে, অত্যন্ত অল্প বয়সে জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি। মেয়র, এমপি হয়েছি। এলাকার জনগণের ভালোবাসা না থাকলে সম্ভবত এতোদূর আসতে পারতাম না। এই বয়সেই আমি কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক। পুরো রাজশাহীর মানুষের কাছে আমি যেতে পেরেছি। শুধু বিএনপি নয়, সব দল থেকেই রাজশাহীর নেতারা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। অতএব, অভিযোগটা ঠিক নয়।

তৎকালীন ছাত্র নেতারা ২২ জন শিক্ষকের তালিকা করে। তাদের গুলি করে মারবে। এদের মধ্যে আইনের জিল্লুর রহমান ও মকবুল হোসেন, পদার্থবিদ্যার আজহার উল ইসলাম, মাহতাব আলী গুল, বাংলার শেখ আতাউর রহমানসহ আরও অনেকেই ছিল। পরবর্তীতে এরা প্রত্যেকেই জামায়াত-শিবিরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বাসিত করতে প্রচুর সাহায্য করে। এমএ বারী ভিসি হয়ে এলে শিক্ষক সমিতি ও ছাত্র সংগঠনগুলো তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা তখন সবক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু করে।'

'৭৯ সালে জামায়াতের পুনর্বাসনে একরামুল হক নামে একজন বিএনপি নেতা ও পুলিশের ডিআইজি এনামুল হক ভালো ভূমিকা রাখেন বলে জানা যায়। জিয়াউর রহমান তখন একদিকে স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের পুনর্বাসিত করছেন অন্যদিকে ছাত্রদলও তখন দাঁড়াচ্ছে।

১৯৮০ সালের ৩ নবেম্বর রাবিতে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল সংঘর্ষ হয়। বহু মানুষের সামনে ছাত্রলীগ কর্মী মীর মোস্তাক এলাহীকে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে হত্যা করে। মুজিববাদী ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে তখন বড় কোনো শক্তি নয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন একজন ছাত্রনেতা ভীষণ জনপ্রিয়। তিনি ফজলে হোসেন বাদশা। দেখতে যেমন সুদর্শন, তেমনি ক্যারিশম্যাটিক। বাম ছাত্ররাজনীতি করেন। তাকে ঘিরেই বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতিতে বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে নতুন মেরুকরণ ঘটে। ১৯৮০ সালের ৬ ডিসেম্বর ৪টি ক্ষুদ্র ছাত্র সংগঠন মিলে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী'। পরে বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী নাম হয় সংগঠনটির। ছাত্রমৈত্রী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরের ১০ বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একক কর্তৃত্ব ছাত্রমৈত্রীর। অন্যদিকে গোপনে শিবিরও পরিকল্পনা আটতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় দখলের।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি '৮০-৯০ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার শুরু

'৮০-র শেষ দিকে ছাত্রশিবিরকে প্রতিষ্ঠার জন্য আরও একজন শিক্ষক কাজ করেন বলে জানা যায়। ইসলামী ছাত্রশিবির তখন ইসলামী ছাত্র সংঘ নামে পরিচিত। গল্পকার হাসান আজিজুল হক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমার জানা মতে, সৈয়দ আলী আহসানও জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর ইসলামী ছাত্র সংঘকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।'

আন্দোলনের মুখে ভিসি বারী বিদায় নেন। নতুন ভিসি হন প্রফেসর মসলেম হুদা। একজন প্রবীণ শিক্ষকের মতে 'শিবিরের রাজনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সময়টা খুবই

'প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ। তাদের হাতে আমি মার খেয়েছি। আমি কেন শিবিরকে সহযোগিতা করতে যাবো?'

ড. সাইদুর রহমান
সাবেক ভিসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গুরুত্বপূর্ণ। শিবিরের ছেলেরা সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় কাজ শুরু করে। দু'একজন যারা ক্যাম্পাসে ছিল তারা সক্রিয়ভাবে জাসদ ছাত্রলীগ ও ছাত্রমৈত্রীর কর্মীদের ভিড়ে মিশে থাকলো। ছাত্রমৈত্রী, জাসদের ভেতরের খবরগুলো তারা গোপনে নিজেদের দলের নেতাদের কাছে পাচার করে।'

অনুসন্ধানে জানা যায়, '৮১ সাল থেকে ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় শক্তি সমাগম করতে থাকে। সারা বাংলাদেশ থেকে শিবিরের ক্যাডাররা জড়ো হয় বিনোদপুর, বুধপাড়া, মেহেরচন্ডী, কাজলা এলাকায়। জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা এসব এলাকায় বাড়ি, মেস বানিয়ে তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করে। জামায়াত কেন্দ্রীয় কমিটি তখন অর্থ দিয়ে সাহায্য করে তাদের মতাদর্শের শিক্ষকদের। আগে জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের সঙ্গে ছিলেন, পরে মতের মিল না হওয়ায় জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এ এলাকার লোক দরিদ্র। জামায়াত এই সুযোগ নেয়। তখন ভালোভাবে শিক্ষক রাজনীতিতে আছি। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে কয়েক লাখ টাকা দেয়া হয়। টাকাটা আসে এমন একজনের কাছে যিনি এখনো শিক্ষকতা করছেন। শিবিরকে কার্যকরী করার জন্য প্রথমে ঢাকায় কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের বাসায় মিটিং হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় '৮১ সালের মধ্যেই শিবিরকে ক্যাম্পাসে ঢোকানো হবে। সে সময় আমি এর বিরোধিতা করি। অন্যদের বলি, শিবির-জামায়াত তো গোপন সংগঠন নয়। সরকার আমাদের রাজনীতি করার অনুমতি দিয়েছে। তাই শিবিরকে রাজনৈতিকভাবে ছাত্রদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কেউ আমার কথা মানলো না। সিদ্ধান্ত হয় '৮১ সালের নবেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যে শিবির ক্যাম্পাসে প্রবেশ করবে। শিবিরের উদ্দেশ্য ছিল তারা কাউকে বাধা দেবে না। কেউ বাধা দিলে প্রতিরোধ করবে। যে কোনো কারণেই হোক, '৮১ সালের পরিকল্পনাটা ভেস্তে যায়। সিদ্ধান্ত হয় মার্চে নবীনবরণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শিবির ক্যাম্পাসে আত্মপ্রকাশ করবে। এ জন্য ব্যাপক প্রস্তুতিও চলতে থাকে। আমি তখনই বুঝতে পারি বিশ্ববিদ্যালয় ভয়াবহ পরিণতির দিকে যাচ্ছে।'

অনুসন্ধানে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাবেক একজন সভাপতি এই তথ্য জানতেন। কিন্তু তিনি বিষয়টি পুরোপুরি চেপে যান। শিবির '৮২ সালের ১১ মার্চ নবীনবরণ কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। প্রগতিশীল সংগঠনের ছাত্রনেতারা শিবিরের কর্মসূচি নবীনবরণ প্রতিহত করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। ১১ মার্চের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি মিছিলে শিবিরের ক্যাডাররা আক্রমণ করে। এই সংঘর্ষে শিবিরের ৪ ক্যাডার নিহত হয়। নিহতরা প্রত্যেকেই বহিরাগত ছিল। রবীন্দ্র গ্রুপের একজন প্রভাবশালী শিক্ষক এ সম্পর্কে বলেন, 'শিবির আক্রমণ না করলেও এক সময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদই তাদের ওপর আক্রমণ করতো।' তিনি আরো বলেন, এই কর্মসূচি নিয়ে বাদশা, শাজাহান সিরাজসহ আরো কয়েকজন ছাত্রনেতাকে ডেকে বলেছিলাম 'শিবিরকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে। তারা আমার কথা শুনল না। শিবিরকে শিবিরের ভাষায় অস্ত্র দিয়ে মোকাবেলা করল। পক্ষান্তরে তারা যে এতে নিজেদের পতন ডেকে আনল এটা বুঝলই না।' অন্য একজন শিক্ষক বলেন, 'মার খাওয়াতে শিবিরের লাভই হল বলা যায়। কারণ, মার খেয়ে তারা স্থানীয় গ্রামবাসীর কাছে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। দাড়ি-টুপি পরা যুবক ছেলেদের কান্না আর নিহতদের লাশ গ্রামবাসীর সহানুভূতি অর্জনে টনিকের মতো কাজ করে। তারা শিবিরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে থাকে। সমর্থনও করতে থাকে জোরালোভাবে।' এই ঘটনার পর আশ্চর্যজনকভাবে মামলা হয় বগুড়ায়, রাজশাহীতে নয়।

'৮২ সালের এই ঘটনা সম্পর্কে সাবেক রাকসু ভিপি ছাত্রনেতা ফজলে হোসেন বাদশা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত ছিলো শিবিরের কোনো

কার্যক্রম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতে দেয়া হবে না। আমরা শিবির নেতাদের ডেকে এ কথা জানিয়ে দিই। কিন্তু তারা আমাদের কথা না শুনে অনুষ্ঠান শুরু করে এবং আমাদের মিছিলে হামলা করে। তখন সাধারণ ছাত্রদের সহায়তায় তাদের বের করে দেয়া হয়।'

বেশ কয়েকজন প্রগতিশীল শিক্ষক ও বিএনপি'র উদারপন্থী শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এরশাদ ক্ষমতায় আসায় জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা খুশি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়াম উদ্বোধন করতে এসে এরশাদ প্রথম বাধার সম্মুখীন হয়। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতিবাদের মুখে ঠিকমতো অনুষ্ঠান শেষ না করেই ফিরে যেতে হয় এরশাদকে। এরশাদ এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়। পুলিশ, আর্মি দিয়ে প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর ওপর অত্যাচার চালায়। এতে কিছুটা হলেও শিবির লাভবান হয়। এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ববিদ্যালয় এক নতুন সংকটে পড়ে। হাসান আজিজুল হক এসময় সম্পর্কে বলেন, 'আমাদের সামনে প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিক্রিয়াশীল না প্রগতিশীলদের হাতে থাকবে?'

১১ মার্চের ঘটনার পর মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাট ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা বিচলিত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে আজহারুল ইসলাম, কোরবান আলী ও শাহ হাবিবুর রহমানের মতো জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা তখন দিশেহারা। জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা তখন কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে এরশাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। জামায়াত প্রগতিশীলদের ঠেকানোর জন্য শিবিরকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব দেয়। বিনিময়ে তারা এরশাদকে সহযোগিতা করবে।

এরশাদ লোভনীয় এই প্রস্তাব লুফে নেয়। এরপর একমুহূর্তও দেরি করেনি সে। সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ তখন শিবিরকে প্রতিষ্ঠিত করতে যা যা প্রয়োজন সবই করছে। বিএনপিপন্থী একজন শিক্ষক বলেন, 'শিবির এরশাদের এই সহযোগিতা একনাগাড়ে '৮৮ পর্যন্ত ভোগ করেছে। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের পুলিশ-আর্মি তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।' ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, 'এরশাদ এক ঢিলে দুই পাখি মারার উদ্যোগ নেয়। এক, সামরিক শাসনের যাতে কেউ বিরোধিতা না করতে পারে সেটা নিশ্চিত করা। অন্যদিকে সামরিক শাসনের পক্ষে সমর্থন দেয়ার জন্য শিবিরকে প্রতিষ্ঠিত করা। এরশাদের এই উদ্যোগ পুরোপুরি সফল না হলেও শিবিরকে দাঁড় করাতে মারাত্মকভাবে সাহায্য করে।' প্রগতিশীল শিক্ষক হিসেবে পরিচিত ড. চৌধুরী জুলফিকার মতিন বলেন, 'জিয়াউর রহমানের কাল থেকে সব সময় শিবির ও জামায়াত তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্ষমতার

উজ্জাল : শিবির বিরোধী ছাত্রদল নেতা ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের মূল স্রোত

কাছাকাছি থাকতে চেয়েছে। তারা সফলও হয়েছে। আমি বলবো, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিবিরকে রাজশাহীসহ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে।'

ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্রমৈত্রীসহ সকল সংগঠন

হিকল : মৈত্রী নেতা, মিছিল থেকে শিবির ক্যাডাররা প্রক্টরের সহযোগিতায় তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়, ২৮ আগস্ট

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে। শিবির তখন আন্দোলন নয়, সংগঠন গোছানোর কাজে ব্যস্ত। '৮২-র পর ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রীয় মদদ পুষ্ট শিবির আবার ক্যাম্পাস দখলের চেষ্টা করে। এবার শিবির বহিরাগত ক্যাডার ও গ্রামবাসী। ১৮ সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাসের দখল নিতে এসে হেদায়েত নামের একজন শিবিরকর্মী নিহত হয়। যদিও গ্রামবাসী জানায়, হেদায়েত কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলো না। এবারও ক্যাম্পাসের দখল নিতে না পেরে শিবির নতুন পরিকল্পনা নেয়। '৮৬ থেকে '৯০ পর্যন্ত শিবির একের পর এক প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলো কে আক্রমণ করে।

ছাত্রমৈত্রী বড় সংগঠন হওয়ায় তাদের

শিমুল : শিবির সমর্থক ছাত্রদল নেতা, ছোট্ট একটি গ্রুপের নেতা হয়েও রাবি ছাত্রদল আহ্বায়ক

শফিকুল ইসলাম মাসুদ, শিবির সভাপতি, রাবি

সঙ্গে নেতৃত্ব ও ক্ষমতার প্রশ্নে ছাত্রদল ছিলো অনেক পিছিয়ে। ছাত্রদল দ্বিতীয় বৃহত্তম সংগঠন হওয়ার পরও তারা মারামারির পথ পরিহার করে। মৈত্রীকে ধ্বংসের জন্য ছাত্রদল কৌশলের আশ্রয় নেয়। '৮৬ থেকে ছাত্রদল সক্রিয়ভাবে শিবিরকে সহযোগিতা করতে থাকে। শিবিরও ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য ছাত্রদলের কাঁধে ভর করে এগিয়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে ছাত্রমৈত্রীর ভেতরে তখন ক্ষয় ধরেছে। তৎকালীন মৈত্রীর একজন নেতা বলেন, 'দল বড় হওয়ার সুযোগে অনেকেই তখন সংগঠনবিরোধী কাজে লিপ্ত। এটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। যা প্রকারান্তরে শিবিরের পক্ষে গেছে।' ক্যাম্পাসে বর্তমান একজন ছাত্রদল নেতা বলেন, 'মৈত্রী ঠেকাতে শিবিরকে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত ছিলো মারাত্মক ভুল।'

ড. জুলফিকার মতিন বলেন, 'শিবির যতো মার খেয়েছে, তত গ্রামবাসীদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি পেয়েছে। তারা ততবেশি মসজিদ, গ্রামগুলোতে নিজেদের শক্তি বিকশিত করতে পেরেছে।'

‘মিনুর সেই জনপ্রিয়তা নেই, সে জামায়াতনির্ভর’

ফজলে হোসেন বাদশা
সাবেক রাকসু ভিপি, সাবেক মৈত্রী সভাপতি

সাপ্তাহিক ২০০০ : বিগত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে আপনি অভিযোগ করছেন। এজন্য মামলাও করেছেন। আপনার অভিযোগের ভিত্তি কি?

ফজলে হোসেন বাদশা : অভিযোগের ভিত্তি জনগণ। আপনি জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তর পেয়ে যাবেন। আমরা হিসাব করে দেখেছি, মিনুর চেয়ে প্রায় ১৬ হাজার ভোট বেশি পেয়েছি। অনেক রাত পর্যন্ত আমি প্রচুর ভোটে এগিয়ে ছিলাম। হঠাৎ করেই ফলাফল ঘোষণা বন্ধ করে দিলো। পরে প্রশাসনের যোগসাজশে নির্বাচনের ফলাফল উল্টে ফেলা হয়। ন্যায়বিচারের জন্য মামলা করেছি। আশা করি আদালতের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাব।

২০০০ : বিএনপি রাজশাহীর বড় সংগঠন। সঙ্গে জামায়াতের সমর্থন। সেখানে তো আপনার দলের অবস্থান দুর্বল। বিএনপি-জামায়াত ঐক্যের বিরুদ্ধে জেতাটা একটু কঠিন মনে হয় না?

ফজলে হোসেন বাদশা : না। কারণ মিনুর সেই জনপ্রিয়তা নেই। সে সব সময় জামায়াতনির্ভর। তার এই জামায়াত নির্ভরশীলতা বিএনপি’র অনেক নেতা-কর্মী পছন্দ করেন না। আমি তো বিএনপি’রও অনেক ভোট পেয়েছি। হ্যাঁ, দলগতভাবে আমাদের অবস্থান দুর্বল। কিন্তু এ এলাকার মানুষ মিনুর অপশাসন, দুর্নীতি দেখতে দেখতে ক্লান্ত। এলাকার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। তারা আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। খোঁজ নিয়ে দেখেন, আমি মানুষের কাছাকাছি যেতে চেষ্টা করি। তারাও আমাকে বিশ্বাস করে।

২০০০ : জামায়াতের উত্থানের কারণ কি?

ফজলে হোসেন বাদশা : অনেক। তারপরও বলবো, এ এলাকায় জামায়াত-শিবিরের উত্থানে মূল ভূমিকা রেখেছে সরকার ও প্রশাসন। বিশেষ করে বিএনপি’র সহযোগিতা জামায়াতকে বিকশিত করেছে। স্থানীয় বিএনপিতে মিনু জামায়াতিদের সবচেয়ে বড় মিত্র। যার প্রভাব শহর-বিশ্ববিদ্যালয় দু’জায়গায়ই পড়েছে। অন্যদিকে বড় দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল বা কাজের সমন্বয়হীনতার অভাব একটা বড় কারণ। এই সুযোগটাই জামায়াত ব্যবহার করেছে।

২০০০ : আপনি এক সময়ের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা। বাম রাজনীতির জন্য রাবি বিখ্যাত ছিলো। আপনারা ব্যর্থ হলেন কেন?

ফজলে হোসেন বাদশা : ব্যর্থ হয়েছি কথাটা সম্ভবত ঠিক নয়। আমরা দীর্ঘদিন এই মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছিল। ’৯০-এর পর থেকে বিশ্ব রাজনীতিও বদলে যায়। রাষ্ট্রে সব সময় কাজ ছিল বাম সংগঠনকে খর্ব করা। এ কাজে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল বিএনপি। রাজশাহী এলাকায় বিএনপি মৈত্রীকে খর্ব করার জন্য শিবিরকে ব্যবহার করেছে। এক পর্যায়ে আমরা প্রশাসন ও শিবিরের অস্ত্রের মুখে ক্যাম্পাস ছেড়ে দেই। তাই বলে লড়াই থেমে নেই। আমি, আমাদের আন্দোলন সব প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে। আর একটা ব্যাপার হলো, গণতান্ত্রিক চর্চা না থাকায় জামায়াত-শিবির বাড়ছে।

২০০০ : আপনাদের কি ভুল ছিল না?

ফজলে হোসেন বাদশা : হ্যাঁ, কিছু ভুলভ্রান্তি তো ছিলোই। জাতীয় পর্যায়ে আমাদের দুর্বল অবস্থানও একটা কারণ। কিন্তু সবচেয়ে বড় ভুল স্থানীয় বিএনপি/ছাত্রদলের। এখন শিবির-জামায়াত তাদেরও ক্ষমা করছে না।

ছাত্রমৈত্রীর কোন্দল ও শিবিরের উত্থান

ভালো সংগঠনের সুফল পায় ছাত্রমৈত্রী, ১৯৮৯ সালে রাকসু নির্বাচনে। ভিপি নির্বাচিত হন রাগিব আহসান মুন্না। ছাত্রমৈত্রীর ভেতরে ততদিনে পচন ধরেছে। বড় সংগঠনের সুবিধায় ছাত্রমৈত্রীর মাঝারি সারির নেতা ও কর্মীরা ক্যাম্পাসে বাকি, ফাও খাওয়া শুরু করেছে। পাশাপাশি ছাত্রমৈত্রীর কর্মীদের বিশাল একটি অংশ তখন নেশা, ছোটখাটো চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানগুলোতে মৈত্রীর এক এক নেতা-কর্মীর তখন বিশাল অঙ্কের টাকা বাকি। অনুসন্ধানে জানা যায়, সিনিয়র নেতারা এটা জানার পরও তেমন কোনো কার্যকরী উদ্যোগ নেয়নি। ছাত্রমৈত্রীর সাবেক একজন বিশ্ববিদ্যালয় নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘সংগঠনের মধ্যে তখন এক বিরাট অরাজকতা ও পচন শুরু হয়েছে। দলের অনেক কর্মী ও নেতা তখন হতাশাগ্রস্ত। বড় নেতারা এসব দেখেও না দেখার ভান করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিবির আমাদের নেতা-কর্মীদের এসব কাজে উৎসাহিতও করেছে।’

জানা যায় ’৯০-এ রাকসু নির্বাচন নিয়ে ছাত্রমৈত্রীর কোন্দল চরমে ওঠে। রাগীব আহসান মুন্না এই নির্বাচনেও ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়। অথচ কেন্দ্রীয় কমিটি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাদের প্রার্থী ছিলেন জহুরুল ইসলাম বাবু। শহরের কাউকে ভিপি হতে হবে এই যুক্তিতে মুন্না ভিপি পদ থেকে সরে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। যদিও রাগীব আহসান মুন্না এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। সাপ্তাহিক ২০০০কে তিনি বলেন, ‘দ্বিতীয়বার ভিপি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ছিল কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রের। দলের কেউ তখন এর বিরোধিতা করেনি।’ জানা যায়, মুন্নার পক্ষের কর্মীরা জহুরুল ইসলাম বাবুকে বেদম প্রহার করে। এক পর্যায়ে ছাত্রমৈত্রীর কেন্দ্রীয় কমিটিও মুন্নাকে ভিপি প্রার্থী হিসেবে মেনে নেয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। নির্বাচনে জহুরুল ইসলাম বাবু সমর্থিত অংশ মুন্নাকে ভোটদানে বিরত থাকে। অন্যদিকে শিবিরের স্বতন্ত্র প্যানেল থাকলেও তারা শুধু ভিপি পদে ছাত্রদলের রিজভী আহমেদকে ভোট দেয়। ভিপি নির্বাচিত হয় রিজভী আহমেদ। শহরের ছেলে মুন্নার ভিপি হওয়া হয় না। রিজভীকে জেতানোর মধ্য দিয়ে শিবির ছাত্রমৈত্রী অপসারণের কাজে পুরোপুরি সফল হয় বলা যায়। ‘রাকসুতে হেরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৈত্রীর কফিনে শেষ পেরেক ঠোকা হয়ে যায়’- বললেন অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম। ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, ‘’৯০-এর রাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত ছিলো মুন্নার গোঁয়ার্তুমি। অনেকেই মনে করেন এর পেছনে আমার মদদ ছিলো। সাংগঠনিকভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত ছিলো, আবার ছিলোও না বলা যায় । তখন পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও প্রচুর ঝামেলা করে। জহুরুল ইসলাম বাবুকে ভিপি দেওয়াই হতো যুক্তিসঙ্গত। ’৯০-এর নির্বাচনে আমাদের পরাজয় শিবিরের উত্থানের অন্যতম প্রধান কারণ বলা যায়। আদর্শিক বিচ্যুতির কথা মানতে আমি রাজি নই।’ বর্তমান প্রশাসনের সঙ্গে আছেন এমন একজন শিক্ষক বলেন, ’৮৯-এর দিকে রাবিতে ছাত্রদল বিকশিত হওয়ার পথে। ’৯০-এর রাকসুতে মৈত্রীর হেরে যাওয়া প্রগতিশীলদের জন্য বিরাট আঘাত। এ সময় ভিসি আমানুল্লাহও শিবিরকে প্রচুর সাহায্য করেন। তিনি প্রথম শিবির নেতাদের পুলিশ প্রহরায় ফুলের মালা দিয়ে ক্যাম্পাসে নিয়ে

পিএস তবে রাবি'র ভিসি?

ড. ফাইসুল ইসলাম ফারুকী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে ভিসির পিএস সোহেলই হলেন ভিসির 'বস'। প্রতিবেদনটিকে সুষ্ঠু রূপ দেয়ার জন্য বর্তমান ভিসির সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ জন্য ভিসির সঙ্গে যোগাযোগ করে সময় চাইলে তিনি তার পিএস-এর সঙ্গে কথা বলতে বলেন। পিএস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ভিসির অফিসে আসতে বলেন। ভিসি অফিসে গেলে 'ক্ষমতাধর' পিএস নানা টালবাহানা করে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখেন। কিন্তু মেলে না ভিসির সাক্ষাৎ। এভাবে পর পর চারদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ভিসির সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বশর্ত যেন খেয়ালি পিএস-এর দয়া। সাক্ষাতের জন্য মোট চারদিন ভিসি অফিসে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করেও কোনো ফল হয়নি। এ সময় দেখা গেছে সাক্ষাৎপ্রার্থী অনেকেই ভিসি'র সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু 'বস'-এর দয়া হয়নি আমাদের ওপর। বরং অনেকবার তার উদ্ধত আচরণের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

আসেন। এমন ভিসি পেয়ে শিবির তো স্বর্গের চাঁদ হাতে পায়। অন্যদিকে শিবির-ছাত্রদল পারস্পরিক সহযোগিতার ফলও পায়। এতে সাম্প্রদায়িক, ফ্যানাটিক শক্তির বিকাশের পথও খুলে যায়। আর মার খায় প্রগতিশীলরা, প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে শিবিরের একনায়কতন্ত্র।' এ বিষয়ে রাবি ছাত্রমৈত্রীর সাবেক সভাপতি সাদাকাত হোসেন খান বাবুল বলেন, 'ইসলামী ছাত্রশিবিরকে আমরা রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করেছি। তারা অস্ত্র দিয়ে আমাদের মোকাবিলা করেছে। ছাত্রমৈত্রী আদর্শভিত্তিক সংগঠন। আদর্শচ্যুতি ঘটে ছিল এটা ঠিক নয়। যারা এটা বলছেন তাদের সংকীর্ণ মানসিকতার প্রকাশ। '৯০-এ বিশ্ব এককেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ায় প্রভাব ছাত্রমৈত্রী ওপরও পড়ে। আদর্শচ্যুতি নয়, বলব রাষ্ট্র প্রশাসন, আমাদের ধ্বংস করতে বিভিন্ন কৌশল নিয়েছে। সাময়িকভাবে তারা সফল বলা যায়। রাগীব আহসান মুন্না বলেন, 'আওয়ামী লীগ-জামায়াত পন্থী শিক্ষকদের আতাত ও শিবিরকে প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। বিএনপি ছাত্রদল তো ছিলই। আমি সভাপতি থাকাকালীন অনেক কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। বাস্তবতা হলো আমার অনুপস্থিতি শিবিরকে ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত করতে সহযোগিতা করেছে। আমি চলে আসার পর আমাদের নেতারা সে রকম সাহসও স্পিরিট নিয়ে শিবিরকে মোকাবিলা করতে পারেনি।'

ড: ফাইসুল ইসলাম ফারুকী বর্তমান ভিসি, বিএনপি নেতা হলেও শিবিরের প্রশ্রয়দাতা

৯১-৯৫ : পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠার পথে শিবির

শিবিরের উত্থানের কারণ জানতে হলে স্থানীয় রাজনীতি জানা প্রয়োজন। বর্তমানে ছাত্র ও শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মতে, শিবিরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে স্থানীয় রাজনীতি। অনুসন্ধানে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিকাংশ অধিবাসী ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় এখানে আসে। এলাকার অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। '৪৭ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী জনগণ মুসলিম লীগের সমর্থক ছিলো। যে কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতাও এখানে বেশি মাত্রায় হয়। বুধপাড়া, মেহেরচন্ডি, বিনোদপুর, কাজলার অর্থনীতি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ভর। দরিদ্র ও মুসলিমলীগ সমর্থকদের আধিক্যের কারণে শিবির প্রথমাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়ে এলাকাগুলো দখলের উদ্যোগ নেয়। সফলও হয়। জানা যায়, '৮০-র দশক থেকে শিবির কর্মীরা এ এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বিয়ে করতে থাকে। ঘরজামাইও থাকে। এই জামাইয়েরা প্রথমে মসজিদে মসজিদে ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করে। পার্টির সহযোগিতায় এলাকার মানুষকে প্রচুর পরিমাণে আর্থিকভাবেও সাহায্য করে। ড. জুলফিকার মতিন বলেন, 'এ এলাকার অধিকাংশ মানুষ মাইগ্রেটেড তার ওপর পশ্চাৎপদ। এদের পশ্চাৎপদতাকেই কাজে লাগিয়েছে জামায়াতপন্থী শিক্ষক ও শিবির। গ্রামবাসীর দিকে কোনো পার্টিই কোনো দিন নজর দেয়নি। তারা এই উদ্যোগ নিলে বিশ্ববিদ্যালয় কোনোদিনই প্রতিক্রিয়াশীলরা দখলে নিত পারতো না।' শিক্ষক ও সাবেক ছাত্রনেতারাও ব্যাপারটিকে স্বীকার করে নেন।

'৯১-এ বিএনপি সরকার গঠনের পর জামায়াত ও শিবির রাষ্ট্র ও প্রশাসন হতে সরাসরি বিশেষ সুবিধা পেতে থাকে। কারণ হলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মতিন চৌধুরী। বিএনপি জামায়াত আঁতাত তো আছেই। অন্যদিকে বিএনপি আমলের দু' ভিসি ড. আনিসুর রহমান ও ড. ইউসুফ আলী এবং রাজশাহীর তৎকালীন পুলিশ কমিশনার আমিনুল ইসলাম শিবিরকে ক্যাম্পাসে পুনর্বাসনের জন্য সবরকম সহযোগিতা দেন। যে কারণে দেখা যায়, বিএনপি'র সময় শিবির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর হামলা চালাতে থাকে। এই সময়ে শিবির নৃশংসভাবে হত্যা করে ছাত্রদলের বিশ্বজিত, নতুন, চাত্রইউনিয়নের তপন, মৈত্রী নেতা জুবায়ের চৌধুরী রিমু, রুপম, আমানকে। অবশ্য হত্যা করতে এসে তাদেরও কয়েকজন কর্মীও নিহত হয়। শিবিরকে এ সময় বিএনপি'র 'জাতিয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে' বিশ্বাসী শিক্ষকগ্রুপ ও সাহায্য করে। প্রশাসন ও রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ক্যাম্পাসে জামায়াত-শিবিরের অত্যাচারে বিএনপি পন্থী একটি শিক্ষকগ্রুপ বাধ্য হয়ে প্রগতিশীল বলে পরিচিত রবীন্দ্র গ্রুপের সঙ্গে জোট বাঁধে। ফলে রবীন্দ্রগ্রুপ শিক্ষকসমিতির নির্বাচনে জয় হয়। এই জোট ভাঙার জন্য সে সময় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ বড় বড় মন্ত্রীরা রাজশাহীতে আসেন। কিন্তু কোনো লাভ হয় না। শিক্ষকদের মধ্যেই

এরকম কুপন দিয়ে হল থেকে শিবির নেতা কর্মীরা জোর করে চাঁদা আদায় করে

জামায়াত শিবির বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়। তারপরও শিবিরের প্রভাব অক্ষুণ্ণই থাকে। কারণ বিএনপি সরকার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মতিন চৌধুরী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. আনিসুর রহমান ও ড. ইউসুফ আলী সফলভাবেই শিবির ও জামায়াতকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। একথা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই মানেন। প্রতিক্রিয়াশীলদের শেকড় এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গভীরে। একনজ শিক্ষক বলেন, 'এই প্রতিক্রিয়াশীলদের ওপড়ে ফেলতে হলে অনেক মূল্য দিতে হবে আমাদের।'

শিবির-ছাত্রদল : ঘরের শত্রু বিভীষণ

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শিবিরের উত্থানের পেছনে অনেক ফ্যাক্টর কাজ করলেও ছাত্রদল নিজেই একটা বড় কারণ। ছাত্রদলের একটা অংশ যেমন শিবিরকে সহযোগিতা করত, তেমনি ছাত্রদলে শিবির বিরোধীও ছিল। বিরোধীদের নেতৃত্বে ছিলেন বাবলু, নিউটন, বুলেট, শাহীন শওকতরা। বিরোধিতা মূলত ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও মুক্তিযুদ্ধের আবেগ নিয়ে। শিবিরমুখী গ্রুপের নেতা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি হারুন-অর-রশীদ। জানা যায়, '৯০-এর শেষ দিকে তিনি প্রকাশ্যে শিবিরকে সহায়তা করেন। ছাত্রদল মার খাচ্ছে তার পরও। হারুনের কাছে শিবিরের চেয়ে বড় শত্রু ছিল প্রগতিশীলরা। হারুনের আগে অবশ্য রিজভী আহমেদও শিবিরকে গোপনে প্রশ্রয় দেয়া শুরু করে আগে থেকেই। বিএনপি ক্ষমতায় এলে তিনি ক্যাম্পাস ছেড়ে দেন।

রিজভী আহমেদ বিদায় নেয়ার পর হারুন ও বাবলুর মধ্যে কোন্দল চরমে ওঠে। হারুনের শক্তি ক্যাম্পাসে শিবির। বাবলু স্থানীয়দের ও অন্য সংগঠনগুলোর মধ্যে বেশ গ্রহণযোগ্য ছিলেন।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, সে সময় 'জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী' গ্রুপ শিবিরকে সহায়তার জন্য হারুনকে ব্যবহার করে। কট্টর বিএনপিপন্থীরা হারুনকে তার অবস্থান থেকে সরে আসার জন্য অনুরোধ করলেও সে কথা শোনেনি। বিএনপিপন্থী একজন শিক্ষক সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'শুধু শিবির-জামায়াতের বিরোধিতা করার জন্য বাবলুকে প্রচন্ড নির্যাতন সহ্য করতে হয়।' জানা যায়, খালেদা জিয়া জামায়াত-বিএনপি বিরোধ মেটানোর জন্য রাজশাহী এলে বাবলু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়গুলি অবহিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বাবলুকে শিবিরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পরামর্শ দেন। একটি সূত্র জানায়, এ সময় বাবলু উত্তেজিত ভঙ্গিতে প্রধানমন্ত্রীর সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। এ ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হন। প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী ছাড়ার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মতিন চৌধুরীর পুলিশ

বাবলুকে গ্রেপ্তার করে এবং নির্মমভাবে পেটায়। বাবলু জেলে গেলে তার সমর্থিত কর্মী-সমর্থকরাও ক্যাম্পাস ছাড়া হয়। শিবিরের মদদদাতা হিসেবে ক্যাম্পাসে থাকে মেরুদন্ডহীন ছাত্রদল নেতা হারুন। সেই হারুন এখন সংসদ সদস্য। আর বাবলু কোনো মতে বেঁচে আছে। দলের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। এ মন্তব্য বর্তমান এক ছাত্রনেতার। হারুন-বাবলুর এই ধারা ক্যাম্পাসে এখনও বিরাজমান।

বর্তমানে রাবিতে ছাত্রদলের শিবির বিরোধী গ্রুপের নেতৃত্ব দেয় আনোয়ার হোসেন উজ্জ্বল। শিবিরের সহযোগিতায় ছোট একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দেয় শিমুল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল বলতে এখন উজ্জ্বলকেই বোঝায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ নেতাকর্মীরা তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। গত ২৫ সেপ্টেম্বর দশ বছর পরে রাবিতে আহ্বায়ক কমিটি হয়। ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ভেবেছিল উজ্জ্বলই আহ্বায়ক হবে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শিমুলকে আহ্বায়ক করে। ইসলামী ছাত্রশিবির এই সিদ্ধান্তে ভীষণ খুশি হয়। এমনকি ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ শিমুলের সঙ্গে কথা বলার জন্য পরামর্শ দেন। শিমুলকে আহ্বায়ক করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ছাত্রদল সম্পর্কে আনোয়ার হোসেন উজ্জ্বল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ' সাংগঠনিক অবস্থা ভালো বা খারাপ কোনোটাই বলা যাবে না। বিগত দিনের সমস্যাগুলো কর্মীরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ১৯৯৩ থেকে শিবির-ছাত্রদলের সংঘর্ষের আতঙ্কই এখন পুরো ক্যাম্পাসে বিরাজ করছে। যিনি আহ্বায়ক হয়েছেন তিনি আমার জুনিয়র। তবে সভাপতি পদের ব্যাপারে আমি আশাবাদী। দল যদি যোগ্য মনে না করে সেটা দলের ব্যাপার। আমি দলের হাইকমান্ডের প্রতি

'বাস্তবতা হলো আমার অনুপস্থিতি শিবিরকে ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত করতে সহযোগিতা করেছে। আমি চলে আসার পর আমাদের নেতারা সে রকম সাহসও স্পিরিট নিয়ে শিবিরকে মোকাবিলা করতে পারেনি'

রাগীব আহসান মুন্না
সাবেক রাকসু ভিপি

পূর্ণমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল।' গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান সেলিম রেজা নিউটন বলেন, 'ক্যাম্পাসে ছাত্রদল টিকে আছে শিবিরের দয়ায়। উজ্জ্বল ছেলেটা বেশ চেষ্টা করছে। ছাত্রদল নিজের শক্তির ওপর দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে তারাই হবে ক্যাম্পাসের প্রধান শক্তি। যদিও শিবিরের পক্ষ থেকে বাধা আসবে। ছাত্রদল নিজের শক্তির ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হলে এই বাধা অতিক্রম অসম্ভব নয়।'

ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের অনেক কর্মী সাপ্তাহিক ২০০০কে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছে, খালেদা জিয়া সরকার গঠন করছে। আর ক্যাম্পাসে ছাত্রদল মার খাচ্ছে। প্রশাসন শিবিরকে সহযোগিতা করছে। এভাবে তো চলতে পারে না। শিবির তোষণনীতির সমালোচনা করে তারা বলেন, শিবির ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত, কারণ ছাত্রদলের সাবেক নেতৃবৃন্দ। এর দায় প্রধানমন্ত্রী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।'

ছাত্রদল কর্মীদের মতামত প্রতিফলিত হলো বিএনপিপন্থী কিছু শিক্ষকের কণ্ঠে। তারাও বললেন, ছাত্রদলকে বাঁচাতে হলে বিএনপিকে অবশ্যই জামায়াত ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর কোনো বিকল্প নেই।'

শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগ সরকার ইউসুফ আলীকে সরিয়ে ড. আব্দুল খালেককে উপাচার্য নিয়োগ দেয়। জামায়াত-শিবিরের আসন টলে যায় সরকারের এই সিদ্ধান্তে। কারণ ড. খালেক জামায়াত বিরোধী বলে পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তিকে তিনি নিজের শত্রু মনে করেন। ইউসুফ আলী অপসারিত হলে শিবির ক্যাডাররা সারা ক্যাম্পাসে নারকীয় তান্ডব চালায়। এরপরই শিবির রাবি'তে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রিয় শক্তির চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। নতুন ভিসি আব্দুল খালেকসহ কয়েকজন শিক্ষকের বাসায় বোমা হামলা ও বিভিন্ন হলে ভাঙচুর করে। এই ঘটনায় সরকারও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে

মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়। সরকার কঠোর অবস্তান নিলে মিবির ক্যাম্পাস চেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ড. আব্দুল কালেকের পরে ড. সাইদুর রহমান ভিসি হন। কেউ কেউ অবিযোগ করেন, সাইদুর রহমানের সময় শিবির কিচুটা স্বস্তি পায়। সাইদুর রহমান এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ। তাদের হাতে আমি মার খেয়েছি। আমি কেন শিবিরকে সহযোগিতা করতে যাবো?'

আওয়ামী লীগের ৫ বছর শিবির ক্যাম্পাসের বাইরে থাকলেও এখন পুর্বাবস্থায়। এখন তাদের বিরোধিতা করে কে? এমন সাধ্য কার?

রিজভী আহমেদ : সাবেক রাকসু ভিপি

সাদাকাত হোসেন খান বাবুল : মৈত্রী নেতা

শিবিরের উত্থান : অন্যান্য কারণ

শিবিরের উত্থানের আর একটি কারণ হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বের একাডেমিক ব্যবস্থা ফলে প্রতিবছর শিবির বেশ কিছু কর্মীসমর্থক পেত। এই সংখ্যা একেবারেই কম নয়। যেটা অন্য দলগুলো পেত না। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, পূর্বের একাডেমিক ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে প্রচুর পরিমাণ ছাত্র/ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো। এ ব্যাপারে ড. খালেকের আগে কেউ কখনও প্রশ্নও তোলোনি। এ প্রসঙ্গে ড. খালেক বলেন, 'শিবিরের ক্যাম্পাসে শক্তি বাড়ার পেছনের মূল কারণ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ব্যবস্থা। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হতো অনুষদভিত্তিক। এর সুবিধা হলো মাদ্রাসার ছেলেরা আরবি লাইনের সাবজেক্টে পরীক্ষা দিয়ে সর্বোচ্চ মার্ক পেত। আর এসব খাতাও দেখতো ইসলামিক স্ট্যাডিজ বা জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা । ফলে তাদের মার্কসে সমস্যা হতো না। এ কারণে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেতো না। এভাবে প্রতিবছর ছাত্রশিবির তাদের সংগঠনের প্রায় ৪/৫ শ' সক্রিয় কর্মী সংগ্রহ করতো। আমি ভিসি হওয়ার পর প্রথম এই জায়গায় আঘাত করলাম। অর্থাৎ ভর্তি পরীক্ষার সিস্টেম পরিবর্তন করে বিভাগভিত্তিক করলাম। শিবির ও জামায়াত এ কারণে আমার ওপর ভয়াবহ চটে যায়। আমার বাসায় আক্রমণ করে। যা হোক, আমি ওদের মেরুদন্ডটা ভেঙে দিয়েছিলাম, বিষদাঁত ভাঙতে পারিনি। তার আগেই আমাকে সরিয়ে দেয়া হয়। এই দুঃখটা আমার সারা জীবন থাকবে।'

এছাড়াও স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন ঘটনার তদন্ত কমিটি হয়েছে ৪০টি প্রায়। আলোর মুখ দেখেনি একটিও। জানা যায়, সাইদুর রহমানের সময় একটি ঘটনায় শিবিরের ১৪ জনকে বহিস্কারের সুপারিশ করে ডিসিপ্লিনারি কমিটি। সিন্ডিকেটে নেবার পরও এই সিদ্ধান্ত পাস করানো সম্ভব হয়নি শিবিরের হুমকি ও অববোধের মুখে। বাধ্য হয়ে সিন্ডিকেট সে সময় এই বিষয়টি স্থগিত রাখে। নতুন ভিসিও এ রিপোর্ট বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী নয় বলে জানা গেছে। কারণ তার ক্ষমতায় আসার পর একটি সিন্ডিকেট অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি তিনি সিন্ডিকেটে অনেননি। ভবিষ্যতে আসার সম্ভবনা নেই বলেই জানালেন একজন সিন্ডিকেট সদস্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলার জন্য একাধিকবার যোগাযোগ করা হয় ভিসি ড. ফাইসুল ইসলাম ফারুকীর সঙ্গে। তার এই প্রতিবেদক একটা সময় দেবে বলে তিনি জানান। পরে ৭ দিনেও ভিসি'র সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে শিবিরের পরিকল্পনা বিশাল ও ব্যাপক। জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থী বলে পরিচিত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, 'তারা রাবিকে সেন্টার করতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয়কে এমন এক জায়গায় নিতে চায় যেখানে তারা সম্পূর্ণ নিরুপদ্রবভাবে কাজ করতে পারবে। এজন্য তাদের চাই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। সেই পথেই তারা আছে।' এই শিক্ষকের কথার সত্যতা পাওয়া যায় গত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে। মিজানুর রহমান মিনু গত নির্বাচনে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করেন। এই নির্বাচনে জামায়াত শুধু দুটি কমিশনার পদ দাবি করে। কমিশনার দু'জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী। এই দু'জনই কমিশনার নির্বাচিত হয়েছেন। এটা শিবিরের ক্ষমতাকে আরও সুসংহত করবে নিঃসন্দেহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবিরের উত্থান প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একজন সাধারণ ছাত্রীকে। নিজেকে তিনি ছাত্রদলের সমর্থক বলে দাবি করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ না বিপক্ষের দল, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ এ প্রশ্নের সমাধান আজো করতে পারেননি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সুবিধাবাদী রাজনীতি বিএনপিকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করছে। যার প্রভাব পড়ছে ছাত্রদলেও । বিএনপিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা না শিবিরের কর্তৃত্ব দেখতে চান। কারণ শিবিরের উত্থানের জন্য বিএনপি সবচেয়ে বেশি দায়ী।'

লেখক হাসান আজিজুল হকের বিশ্বাস 'বিশ্বায়নের নামে সারা বিশ্বে যা হচ্ছে তাতে বাম, সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন মার খেয়েছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সাধারণ জনগণের শক্তি কখনো মেরে ফেলা যায় না। নিশ্চয়ই একদিন জনগণ মৌলবাদ বা প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হবেই। সেই শক্তি অপ্রতিরোধ্য। সেই স্বপ্ন নিয়েই আমি বেঁচে আছি। শিবিরের উত্থান, এর পেছনে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনেক উপাদান কাজ করেছে। তাদের অস্ত্র, অর্থ, প্রশাসন আছে। সুতরাং এই জায়গায়ই আমাদের লড়াই। আমরা একটা খারাপ সময়ের মধ্যে আছি। এটা বেশিদিন থাকবে না। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের বিজয় সুনিশ্চিত।'

আমরা এই বিশ্বাসের সঙ্গে একমত হতে চাই, একথা বিশ্বাস করতে চাই। কারণ আমরা তো স্বপ্ন দেখি সোনালি সেই দিনের, যে দিন প্রতিক্রিয়াশীলতার দাবানল আমাদের দাহ্য করবে না।

তবে আমরা শুধু স্বপ্নই দেখি। স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কিছু করি না। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মব্যবসায়ী দানবরা আমাদের সুন্দর স্বপ্নগুলো ভেঙে চুরমার করে দেয়। আওয়ামী লীগ বিএনপি তাদের ব্যবহার করতে চেয়ে নিজেরাই ব্যবহৃত হয়ে যায়। এটা আবার তারা নিজেরা বুঝতে পারে না, বুঝতে চায় না। বিএনপি-আওয়ামী লীগ যদি প্রতিক্রিয়াশীল দানবীয় শক্তি জামায়াত-শিবিরের কৌশল বুঝতে দেরি করে ফেলে, তাহলে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হবে দেশবাসীর। হয়তো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পুরো রাজশাহীতেই জামায়াত ছাড়া আর কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সহযোগিতায় **মাসুদ রুমী**